এমপিওভুক্ত হবে ১০৫০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্বচ্ছতা যেন বজায় থাকে

আমাদের শিক্ষার হার আমরা এখনো শতভাগে উন্নীত করতে না পারলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব কিন্তু নেই। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবী ও দানশীলদের একটাই লক্ষ্য থাকে নিজ এলাকায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। কেউ বাবা-মায়ের নামে, কেউ নিজের নামে, কেউ প্রতিষ্ঠানের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হওয়ার প্রথম কিছুদিন সবার মধ্যেই বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। এক সময় উৎসাহ মরে আসে, তখন সাক্ষী গোপাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সবগুলোর যে এমন অবস্থা হয় তা নয়। সরকারের যারা খুব কাছাকাছি থাকেন, তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে ম্যানেজ করে শেষ পর্যন্ত যে ধন্বন্তরী বটিকা সংগ্রহ করেন, তার নাম এমপিও (মনথলি পেমেন্ট অর্ডার)।

বাংলাদেশে আজ যে শিক্ষার হাল, তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত বাণিজ্য কোনো অংশে কম দায়ী নয়। দেখা যায়, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ছাত্রছাত্রী আছে, অবকাঠামোগত সুবিধা আছে, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী আছে, কিন্তু বছরের পর বছর দেনদরবার করেও এমপিওভুক্তির সার্টিফিকেট জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। আবার কোনো রকম বাঁশের খুঁটির ওপর একটি টিনের দোচালা দাঁড়িয়ে আছে, ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের পরিমাণ বেশি, সেই শিক্ষকরা আবার ব্যস্ত স্থানীয় রাজনীতিতে– সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান খুঁটির জোরে এমপিওভুক্ত হয়ে যায়। ফলে এমপিওভুক্ত হওয়া ও না হওয়া নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। ভালো ও অভিজ্ঞ শিক্ষকরা তার চাকরিকে এমপিওতে ন্যস্ত করার জন্য ক্যাটেগরি ছাড়া স্কুলে চাকরি নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন ফলে একটি ভালো স্কুলের (এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে) অপমৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে নামকাওয়াস্তে একটি স্কুল এমপিওভুক্তির কারণে শিক্ষকের পদভারে (ছাত্রছাত্রীবিহীন) মুখরিত থাকে।

বিষয়টি সরকারের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টিগোচর হয় ২০০৪ সালে। সে সময় অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০০৪ সালের সবশেষ এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪৯০, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭, মাদ্রাসা ৭ হাজার ৩৪২, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ৬৬৩, অন্যান্য ৪০৬। ওই বছর সর্বাধিক ১ হাজার ৮০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিওভুক্ত করা হয়। তারপরও খাতওয়ারি বরাদ্দ বন্ধ থাকলেও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৩টি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সাতটি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় ৩ হাজার ২১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষক রয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়, এরপর দেয়া হয় একাডেমিক স্বীকৃতি। তারপর শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা মূল্যায়নের পরই এমপিওভুক্তির অনুমোদন দেয়া হয়।

এমপিওভুক্তির জন্য চলতি অর্থবছরে বাজেটে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হাজার হাজার আবেদনের মধ্য থেকে ২০০৯-১০ সালে ১ হাজার ৫০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে। শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠানো এক পত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে বলে যায়যায়দিনের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে।

এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় হাজার হাজার আবেদনের মধ্য থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি স্কুল মিলিয়ে ১ হাজার ৫০টি প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করবে। আমরা মনে করি, এখানে সর্বাধিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। বাছাই কার্যক্রম চালাতে গিয়ে কোনো রকম অসদুপায় অবলম্বন করলে বিঘ্নিত হবে শিক্ষা কার্যক্রম। কোনো ফাঁক-ফোকর ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নড়বড়ে প্রতিষ্ঠান যদি এমপিওভুক্তির অনুমতি পায় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা যে তিমিরে আছে, সেখানেই থেকে যাবে।

বাছাই কার্যক্রম চালাতে গিয়ে কোনো রকম অসদুপায় অবলম্বন করলে বিঘ্নিত হবে শিক্ষা কার্যক্রম। কোনো ফাঁক-ফোকর ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নড়বড়ে প্রতিষ্ঠান যদি এমপিওভুক্তির অনুমতি পায় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা যে তিমিরে আছে, সেখানেই থেকে যাবে।